Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ তত্ত্ব ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

The Asabiyyah Theory of Ibn Khaldun and the Development of Muslim Nationalism

Farhana Afrin*

ABSTRACT

Since ancient times the strong group feeling works as the prime driving force to rise into power and to rule thereby. The dynasties declined as soon as the group feeling became fragile. Ibn Khaldun depicted this issue through his remarkable theory of Asabiyyah. During the reign of Prophet (PBUH) and Four Rightly Guided Caliphs Islamic brotherhood instead of asabiyyah served as the core impetus. However, subsequent Muslim dynasties clung to the asabiyyah to rise into power. Afterwards the western nationalism developed among the Muslims gradually. This article explores the genre of nationlism evidently present in the contemporary Muslim world and asserts that it springs out of the offshot of asabiyyah. The article has followed exploratory research method and historical method in parallel.

Keywords: ibn khaldun, asabiyyah, muslim nationalism, muslim brotherhood, pan-islamism.

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবী শাসনকারী সাম্রাজ্যগুলোর ক্ষমতায় আরোহন এবং ক্ষমতায় টিকে থেকে শাসনকার্য পরিচালনার পেছনে সবসময়েই শক্তিশালী কৌমচেতনা কাজ করেছে। আবার যখন এই কৌমচেতনার শিথিলতা এসেছে তখনই সাম্রাজ্যগুলোর পতন হয়েছে। ইবনে খালদুন তাঁর আসবিয়্যাহ তত্ত্বের মাধ্যমে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ স. এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আসাবিয়্যাহর পরিবর্তে ইসলামী ভ্রাতৃচেতনাই মুসলমানদের মূল প্রেরণা ছিলো।

* Farhana Afrin is a Masters student in the department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: farhanaafrin81@gmail.com

তবে পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে আসাবিয়্যাহ আবার ক্ষমতার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। তারপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে আসাবিয়্যাহর প্রভাব থেকে সৃষ্ট বর্তমান মুসলিম বিশ্বে জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা তুলে ধরা হয়েছে। বৃহত্তর মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান-পতন ও ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আসাবিয়্যাহর প্রভাব পর্যালোচনার মাধ্যমে বিকাশধারা নিরূপণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। গবেষণায় অনুসন্ধানমূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ: ইবনে খালদুন; আসাবিয়্যাহ; মুসলিম জাতীয়তাবাদ; মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ; প্যান-ইসলামিজম।

ভূমিকা

মানব ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন নিয়ামক হলো- বেঁচে থাকার আগ্রহ। এই বেঁচে থাকার ইতিহাসটি সংগ্রাম মুখর, উত্থান-পতনের ও জয় পরাজয়ের। এ সংগ্রাম কখনোবা প্রকৃতির সাথে, আবার কখনো মানুষে-মানুষে একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে। প্রতিপক্ষ মানুষ হোক কিংবা প্রকৃতি জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার স্বার্থেই মানুষে মানুষে মৈত্রী হয়েছে। বহুর মাঝে ঐক্যের ভাবধারা তৈরির প্রয়াসই হলো এ মৈত্রীর লক্ষ্য। ইতিহাসের অনেক সময় জুড়ে এ বন্ধন 'গোত্র' পরিচয়ে প্রকাশ পেলেও উত্তর আধুনিককালে (post modern) এর নাম হলো 'জাতি' (nation)। সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক ইবনে খালদুন[১] (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) মানুষের এই বেঁচে থাকার সংগ্রামে 'আসাবিয়্যাহ' বা গোত্রীয় চেতনাবোধকেই একমাত্র অবলম্বন বলে নির্দেশ করেছেন (Nuruzzaman 2013, 11)। তিনি মানব সভ্যতার মূল খুঁটি হিসেবে বিবেচনা করেছেন আসাবিয়্যাহকে। তার মতে, এর হাত ধরে একটি গোত্র ক্ষমতার মূলকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে। গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতিতে বলীয়ান হয়ে

১. আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাযরামী। ইবনে খালদুন ১৩৩২ সালে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসের এক প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত একজন ঐতিহাসিক। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের জনক, সমাজ বিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক, অর্থনীতির জনক হিসেবেও তিনি পরিচিত। মাত্র ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা জীবনের পাঠ চুকিয়ে তিউনিসিয়ার হেফসী রাজদরবারে 'সাহিবে আলামাহ' হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ ছাড়াও মরক্কোর মারিনী রাজদরবারে 'ধর্মীয় উপদেষ্টা' ও পরে রাজ্যসচিব পদে গ্রানাডার রাজদরবারে রাজদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৮২ সালে ইবনে খালদুন মিসরে গমন করেন। এখানে তিনি শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হন। পরে প্রধান কাজীর দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- কিতাবুল ইবার, আল-মুকাদ্দিমা, বিখ্যাত তত্ত্ব- the theory of Asabiyah বা, 'আসাবিয়্যাহ তত্ত্ব। ইবনে খালদুন ১৪০৬ সালে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। (Enan 2006)

কোন গোত্র একটি নতুন সাম্রাজ্য, নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে পারে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে (Ibn Khaldun 2017, 243)। কিন্তু এই আসাবিয়্যাহ প্রত্যয়কেই ইসলাম ব্যাখ্যা করেছে ভিন্ন আঙ্গিকে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

> لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ
>
> সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে, যে তার স্বগোত্রের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর যে তার স্বগোত্রের জন্য মৃত্যুবরণ করে। (Abū Dāwud 2008, 5121)

ইতিহাস ৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতার ক্রমোত্থান থেকে পতন, আর প্রায় ১৩শত বছরের পৃথিবীব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য অবলোকন করেছে। এই উত্থান-পতনে আসাবিয়্যাহর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যেমন প্রয়োজন তেমনি সংকটসঙ্কুল মুসলিম বিশ্বে সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত পুনর্জাগরণের উপকরণ হিসেবে এর প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইও প্রয়োজন। কেননা মুসলিম জাতীয়তাবাদের সীমিত গণ্ডি ছাপিয়ে ভিন্ন কোন চেতনায় মুসলিম সভ্যতার পুনঃবিকাশ সম্ভব হতে পারে কি না, তা এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরে এক এক করে জন্ম নেয়া অর্ধশতাধিক জাতিরাষ্ট্র, ঐক্যবিহীন মুসলিম স্বার্থে গঠিত সংস্থাগুলো এবং মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার লক্ষ্যে ময়দানে অবতীর্ণ একাধিক রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা এই প্রশ্নকে আরো যৌক্তিক করে তুলেছে। এমতাবস্থায় আসাবিয়্যাহ ও মুসলিমদের জাতীয় চেতনার সম্পৃক্ততা মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজনেই গবেষণার দাবিদার।

আসাবিয়্যাহ

শাব্দিকভাবে আসাবিয়্যাহ (عصبية) বলতে বুঝায় দৃঢ় বন্ধন (Oxford 1995, 140)। এটি ইসাবা (عِصَابَة) শব্দ থেকে এসেছে। এর দ্বারা কোন ব্যক্তির একটি দল বা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি বুঝায় (Fuad Bali 1998, 43)। রাসূলুল্লাহ স.ও আসাবিয়্যাহ (عصبية) বা গোত্রপ্রীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন ক্বওম (قوم) শব্দ দ্বারা।

একবার সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আসাবিয়্যাহ বা গোত্রপ্রীতি কি? রাসূলুল্লাহ স. প্রত্যুত্তরে বললেন, "অন্যায় কাজে নিজ জাতিকে সহযোগিতা করা"[২] (Abū Dāwud 2008, 5119) অনেকের মতে, "এটি সমাজস্থ মানুষের 'আমরা' অনুভূতি। এই বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি কখনো নিজেকে গোত্র থেকে ভিন্ন কোন সত্তা হিসেবে কল্পনা করে না।" (Nuruzzaman 2013, 19)

২. عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ

আধুনিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, ইবনে খালদুন স্বগোত্রের প্রতি মানুষের আপনবোধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আসাবিয়্যাহ হিসেবে। ইবনে খালদুনের পূর্বে প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের থেকে জাতি রাষ্ট্রের তেমন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। তারা নগর রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যার মূলভিত্তি ছিলো অভিজাততন্ত্র (Sen 2008, 14)। কালক্রমে মানব সমাজের বিস্তৃতির সাথে সাথে এই আপনবোধ একটি নির্দিষ্ট গোত্রের গণ্ডি পেরিয়ে সমভাবাবেগ সম্বলিত আরো কয়েকটি গোত্রসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, এটি তখন ক্বওমিয়্যাত বা জাতীয়তা নামে পরিচিতি লাভ করে। সর্বশেষ এই জাতিবোধে গ্রন্থিত গোত্রগুলো যখন একটি শক্ত জাতিগত বন্ধনের সাথে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দ্বারা একটি ভৌগোলিক পরিচিতি লাভ করে তখন তার নাম হয়েছে ওয়াতানিয়্যাত বা জাতিরাষ্ট্র। তাই বর্তমানের রাষ্ট্রগুলো তার নাগরিকদের থেকে যে ধরনের ভালোবাসা, আবেগ, সহমর্মিতা, আনুগত্য ও ত্যাগ আশা করে তাকেই ইবনে খালদুন আসাবিয়্যাহ বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন (N. Zaman 2012, 394-400)।

ইবনে খালদুন মানুষের আদি চেতনার একটি অংশ হিসেবে আসাবিয়্যাহকে উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রতিটি সভ্য জাতিকে প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় (Ibn Khaldun 2017, 233)। আর সুদৃঢ় ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনই তাদের এই টিকে থাকাকে সুনিশ্চিত করে (Ibid, 243)। গোত্রপ্রীতি ও সুদৃঢ় বন্ধন শক্তিশালী করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রশক্তি লাভ করা সম্ভব (Ibid, 265)। এই ধারণা থেকে আসাবিয়্যাহর মৌলিক ৩ টি দিক পাওয়া যায়-

১) এটি একটি চিরন্তন অনুভূতি;

২) টিকে থাকার লড়াইয়ে মানুষ বারবার এর শরণাপন্ন হয়েছে;

৩) পৃথিবীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশ অব্যাহত থেকেছে আসাবিয়্যাহকে কেন্দ্র করে।

মূলত, আসাবিয়্যার মাধ্যমেই সমাজ তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের কাজ করে এর মূল্যবোধ ও ধারণাসমূহ পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চার করে। (Ahmad 2002, 20-45)

আসাবিয়্যাহ ও জাতীয়তা উভয়ের চূড়ান্ত রূপ হলো রাষ্ট্রশক্তি লাভ করা। অর্থাৎ জাতিরাষ্ট্র গঠন করা। আসাবিয়্যাহ হলো মানুষের অন্তঃস্থ অনুভূতি, যা একজন মানুষ তার স্বগোত্র, স্বজাতির প্রতি অনুভব করে। জাতীয়তাবোধও অনুরূপ একটি অনুভূতি। এই অনুভূতি একসময় প্রবল হয়ে একটি রাষ্ট্র- একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইবনে খালদুনের মতে এই স্বজাতি বোধ তৈরি হয় রক্ত, বংশ এবং আত্মীয়তা বা সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। মাঝে খুলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল স্বল্প সময়ে

মুসলিম ভ্রাতৃচেতনায় সমৃদ্ধ, সীমিত স্বজাতি বোধের প্রভাবমুক্ত ইসলামী রাষ্ট্রনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। কিন্তু কিছুকাল পরেই গোত্রশক্তিতে বলীয়ান মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান ঘটে। আরব বেদুইন সমাজে, পরিবার রক্ত ও বংশের কৌলীন্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা হতো বিধায় ভিন্ন ভাষা, অঞ্চল, রাজনৈতিক স্বার্থ এখানে আপনাতেই স্থান পেতো না। তাই খালদুনের বিবৃত আসাবিয়্যাহ বা জাতিবোধে এই উপাদান গুলো স্থান পায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে মানুষের আপন-পর বোধ বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল বা স্বার্থের একতার ভিত্তিতেও জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠে। আর এই কারণেই খালদুন পরবর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাতীয়তার উপাদানে এই বিষয়গুলোকেও সম্পৃক্ত করেছেন।

জাতীয়তাবাদ

স্বভাবগতভাবে মানুষের মাঝে একটা নিজস্ববোধ রয়েছে, যার ফলে তার মধ্যে আপন পরের একটা চেতনা কাজ করে। যখন বিজ্ঞান গতি পায়নি, মানুষ তার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানার মাঝে আবদ্ধ থেকেছে, তখনও মানুষের মাঝে গোত্র-সম্প্রদায় ইত্যাদি ধারণা বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ তার সীমিত গণ্ডি পেরুতে সক্ষম হয়, অন্য ভূখণ্ডের অপরাপর মানুষের সাথে মেশার সুযোগ হয়, তার মাঝে তৈরি হয় আপন পর চেতনা, স্বজাতির কল্যাণ চেতনা। এর দ্বারা মানবসমাজে জাতিসত্তা বিকাশ লাভ করে। কাল পরিক্রমায় ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর এই জাতীয়তাবোধ যখন রাষ্ট্র গঠনের মতবাদে উন্নীত হয়, তখন তার নাম হয় জাতীয়তাবাদ (Haque 2014, 56-57)। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি গ্যাটেলের সংজ্ঞানুযায়ী, "একটা জাতি রাষ্ট্রের বিকাশ কোন বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে হয় না। বরং স্থানীয় অবস্থা এবং অতীত-ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশধারা প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র জাতীয়তার রূপ দেয়।" (Gettel 1950, 90) অর্থাৎ তার মতে, বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে একতার ভিত্তি যতটা দৈহিক তার চেয়ে বেশি মানসিক। একটা জাতি গড়ে উঠে কোন একটা সমচেতনার ভিত্তিতে। এই সমচেতনা যখন রাজনৈতিক আকার লাভ করে তখন তাকে জাতি বলে। জাতির এই চেতনাই হলো জাতীয়তা। যেটি সাধারণত ৬ টি উপাদানের মাধ্যমে গড়ে উঠে- ১) গোত্রীয় ঐক্য, ২) ভাষার ঐক্য, ৩) ধর্মীয় একতা, ৪) ভৌগোলিক একতা, ৫) রাজনৈতিক লক্ষ্যের একতা এবং ৬) সাধারণ স্বার্থ (Ibid, 52-54) ।

এই বিবেচনায় জাতিসংঘের স্বীকৃত ১৯৪টি জাতিরাষ্ট্র ছাড়াও পৃথিবীর মানচিত্রে আরো প্রায় অর্ধশতাধিক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান। মূলত ঔপনিবেশিক শাসনামলে সারা বিশ্বে জাতীয়তার বহুমাত্রিক চেতনার সর্বাধিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয়তার একেকটি দিক ধারণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় শ'দুয়েক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। এমনকি সর্বশেষ স্পেনের কাতালানরা অতি সম্প্রতি তাদের আলাদা জাতিরাষ্ট্রের ঘোষণা সম্পন্ন করেছে। এ ক্ষেত্রে কুর্দ, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, তামিল, মরো ইত্যাদি জাতিকে তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেখা যায়। এমনকি যে জাতিগুলো বর্তমানে জাতিরাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে বিদ্রোহ, রক্তপাত আর সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাস। স্বজাতির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ বারবার জাতিগত বিবাদ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। স্বজাতি নির্ধারণের মানদণ্ড কি হবে তা সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ করেছেন। তারা স্বজাতি চেতনার নির্দিষ্ট মানদণ্ড দাঁড় করাতে চেয়েছেন, জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করেছেন। পরিবার, বংশ, অঞ্চল, নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা, সামাজিক শ্রেণী, আয়, পেশা, ধর্মীয় পরিচিতির মতো মানুষের একেকটি পরিচায়ক জাতীয়তাবাদের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়েছে (Fuller 2016, 261)। এছাড়াও দেশীয় ভিত্তি, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, অর্থনৈতিক স্বার্থ, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এই বিষয়গুলোও জাতিগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে (Haque 2014, 58)। এই উপাদানগুলোর কোন একটিকে কেন্দ্র করে অথবা একাধিক উপাদান নিয়েই কোন এলাকার জনগণ তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন লক্ষ্য-উপলক্ষ্য সামনে রেখে এক হতে চায়। পারস্পরিক কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তাদের মাঝে ঐক্য গড়ে উঠে। এই ঐক্যের মাঝে ২টি মৌলিক ভাবধারা প্রাধান্য পায়। তার প্রথমটি হলো- বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আর, দ্বিতীয়টি হলো- বহুত্বমূলক সমন্বয়।

এ দু'টি ভাবধারার যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে বিরাজমান বৈচিত্র্য, স্বকীয়তা ও বহুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েই কল্যাণমূলক জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ রকম জাতীয়তায় দুই বা বহু জাতিকে দেখা যায় মিলিত ঐক্যে। আবার একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত দেখা যায়। কিন্তু উপরোক্ত দু'টি ভাবধারা যদি অনুপস্থিত থাকে কোন জাতির চেতনায়-মননে, তাহলে সে জাতি বা রাষ্ট্র অসুস্থ জাতীয়তাবোধ লালন করে। তাদের জাতীয়তা হয় বিকারগ্রস্ত। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এবং বর্তমানেও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোতে আমরা এই বিকারগ্রস্ত জাতীয়তাবোধের চর্চা দেখতে পাই। ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়তা বিকারগ্রস্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে, ইতালিতে ফ্যাসিবাদে এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদে রূপ নেয় (Haque 2014, 58)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রই জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবাদ চর্চা শুরু করে। যেটি আবার বিশ্বায়ন নাম ধারণ করে নতুন সাম্রাজ্যবাদে পুরো বিশ্বকে এক করেছে।

‘মুসলিম জাতীয়তাবাদ’ ধারণা

কেউ কেউ ধারণা করেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবর্তক বলা হয় খলীফা উমর রা. কে। উমর ফারুক র. এর প্রশাসনিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁকে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো। তার মাঝে অন্যতম হলো, আরব ভূখণ্ড থেকে তিনি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বিতাড়ন করেছিলেন এবং আরবে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন (Shibli Nomani 2018, 313)। এরই ভিত্তিতে উমর ফারুক রা. কে মুসলিম জাতীয়তাবাদের জনক বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ ধারণা করা সঠিক নয়। কারণ আল্লাহর রাসূলের স. সময়কাল থেকে ইয়াহুদীদের বারবার সীমালংঘন ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স. ৪র্থ ও ৯ম হিজরীতে তাদেরকে প্রথমে মদীনা থেকে খায়বারে এবং পরে খায়বার থেকে সিরিয়ায় বিতাড়ন করেন (Qutub 2011, 127-128)। উমর রা. এর শাসনামলেও অনুরূপ কারণেই তাঁকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের অন্যায় কাজের শাস্তি হিসেবে এহেন পদক্ষেপ মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক হতে পারে না; বরং উমর রা. জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ চেতনা থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে অন্য একটি অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁর রাজ্যের যিম্মীদেরকে একটি বিশেষ প্রকার কোমরবন্দ ও টুপি পরিধানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ অভিযোগটিও পূর্বের অভিযোগের মত একপেশে ও বিভ্রান্তিমূলক। তিনি যিম্মীদের জন্য তাদের বহু যুগ থেকে প্রচলিত পোশাকই নির্ধারণ করেছিলেন। যা ছিলো ‘যুন্নার’ নামক একপ্রকার কোমরবন্দ ও একটি লম্বা টুপি। মূলত উমর ফারুক রা. যিম্মীদেরকে মুসলমানদের অনুসরণ করা থেকে এবং মুসলমানদেরকে যিম্মীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন (Shibli Nomani 2018, 315)। এটা মুসলমান ও যিম্মীদের মাঝে জাতীয়তার প্রভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বা পারস্পরিক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার জন্যও নয়। উমর রা. এর শাসনরীতিতে ইসলামের সেই সৌকর্যগুলোই অনুশীলন করা হয়েছিলো যেগুলো কুরআনের পাতায় পাতায় বিবৃত হয়েছে। সেগুলো হলো- ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, শালীনতা, শাসনতান্ত্রিক সমতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার সর্বোত্তম উদাহরণ (Ansari 2018, 87)।

আসাবিয়্যাহ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ

ইবনে খালদুন যে আসাবিয়্যাহ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার কথা বলেছেন, পরবর্তীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সময়ে (১৭৫০ খ্রি.) তা

জাতীয়তাবাদ নামে পরিচয় লাভ করে। ইবনে খালদুন এই স্বজাতি চেতনার ৩টি উপাদান নির্দেশ করেছেন, ১. রক্ত সম্পর্ক, ২. বংশ, ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক (Ibn Khaldun 2017, 297)।

পরবর্তীতে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভূখণ্ড, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, ন্যায়-অন্যায় বোধ ইত্যাদির ঐক্যকেও স্বজাতি চেতনা তৈরির উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। (Islam 2014, 315-316) এখানে লক্ষণীয়, ইবনে খালদুন মুসলিম সাম্রাজ্যের সোনালি সময়ের মানুষ হয়েও আসাবিয়্যাহর উপাদান হিসেবে ধর্মকে উল্লেখ করেননি। অথচ এই মুসলিম সভ্যতার সূচনা হয়েছিল সুদৃঢ় মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে। এটাই এ সাম্রাজ্য ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে ইতিহাসে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইবনে খালদুন আসাবিয়্যাহকে সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি লাভের একমাত্র উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Ibn Khaldun 2017, 291)। কোন রাষ্ট্র শক্তিই সুদৃঢ় আসাবিয়্যাহ এর বন্ধন ব্যতিরেকে ক্ষমতায় আসীন হতে পারে না। অথচ ধর্ম আসাবিয়্যাহর উপাদান না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের ভিত্তিতে মুসলমানরা রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করে এবং এই রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্তি লাভ করে প্রায় ১৩শত বছর ধরে পৃথিবী শাসন করে।

এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যে দুইভাবে ক্ষমতায়ন হয়। প্রথমত, আদর্শের ভিত্তিতে। এ সময়টা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন থেকে শুরু হয়ে খোলাফায়ে রাশেদার সময় পর্যন্ত (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)। এ সময়ে মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি অর্জন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের প্রসার ঘটে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও উম্মাহ চেতনাকে সামনে রেখে। দ্বিতীয়ত, ৬৬১-১৯২১ সাল পর্যন্ত যে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি তার ভিত্তি ছিলো আসাবিয়্যাহ। অর্থাৎ দৃঢ় আসাবিয়্যাহ চর্চার ফলে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, সেলজুক, অটোম্যান, মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আবার আসাবিয়্যাহ-এর শিথিলতার কারণে এই সাম্রাজ্যগুলো পতনের মুখোমুখি হয়। ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ তত্ত্ব মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলিম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক। কেননা, ইবনে খালদুন নিজেও এই দ্বিতীয় যুগের লোক ছিলেন।

ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে জাতীয়তাবাদ

ইসলামের প্রথম যুগের অনন্য সব নজীরের সাক্ষী হয়েও, এর সৌন্দর্য্য-মাহাত্ম্য অবলোকন করার পরও মুসলমানদের আবার গোত্রপ্রীতি বা আসাবিয়্যাহ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া বিস্ময়কর। এমনকি মাত্র চল্লিশ বছরের মাথায় অনেক সাহাবী বেঁচে থাকা অবস্থায় আসাবিয়্যাহ ফিরে আসে। ইসলাম আগমনের পূর্বে বেদুইন জীবনে

অভ্যস্ত আরবদের মাঝে গোত্রপ্রীতি ছিলো অত্যন্ত প্রবল। আরব বেদুইনদের এমন গোত্রপ্রীতি ছিলো খুব স্বাভাবিক ও তাদের জীবন প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট প্রতিকূলতায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই আরবদের সুদৃঢ় গোত্রপ্রীতি অত্যন্ত জরুরী ছিলো। ইবনে খালদুনের মতে, "একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী গোত্রগুলোই মরুপ্রান্তরে বসবাস করতে সক্ষম।" (Ibn Khaldun 2017, 243) এহেন গোত্রপ্রীতি ও কঠোর জীবনপ্রণালীর কারণে আরবদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে কঠোরতা, হিংস্রতা ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব গড়ে উঠেছিলো। অন্য গোত্রের আক্রমণ থেকে তারা যেমন নিজেদের রক্ষা করতো, ঠিক তার বিপরীতে নিজেদের জীবিকাকে নিরুপদ্রব করতে অপর গোত্রের উপর অত্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। তাদের এমন বর্বর জীবনাচরণের কারণেই ইসলামপূর্ব আরব ছিলো সভ্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে। এরা বংশগত কৌলিন্য রক্ষা করতো অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। গোত্রের মর্যাদা রক্ষা, অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং স্বীয় গোত্রের প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্য এই আরব বেদুইনরা যুদ্ধ আর রক্তপাতে লেগে থাকতো বছরের পর বছর।

এমন সময় আরব উপদ্বীপে ইসলাম আগমন করলে এই শতধা বিভক্ত আরব গোত্রগুলোর বর্বর জীবনকে পরিবর্তন করে সভ্যতার আলো জ্বেলে নিজেদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বাঁধনে আবদ্ধ করে। তাদের বিশৃংখল জীবন সুশৃংখলিত হয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস- জীবনাচরণ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়। পরস্পরের রক্তপাতে লিপ্ত মানুষগুলো হয়ে উঠে একে অন্যের রক্ত-সম্পদের অতন্দ্র প্রহরী। এমনিভাবে ইসলামের আলো বেদুইনদের মনের অন্ধকার গলিগুলোকে আলোকিত করে আরব উপদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। চার দশক পেরিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন শক্ত-পোক্ত, ওসমান রা.-এর শাহাদাতের পর আলী রা.-এর খেলাফতকালে আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা.-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং এর জের ধরে আলীর রা. শাহাদাত ও মুয়াবিয়ার রা. ক্ষমতা গ্রহণ উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যকার পূর্ব থেকে বিদ্যমান গোত্রীয় বিবাদকে আরো ঘনীভূত করে। এরপর মুয়াবিয়ার রা. পর যখন তাঁরই পুত্র ইয়াজীদ ক্ষমতারোহন করেন তখনই গোত্র-ভিত্তিক রাষ্ট্রশক্তির উত্থান হয় মুসলিম সাম্রাজ্যে।

গোত্রপ্রীতির সহজাত চেতনায় আত্মসমর্পণ

এ পর্যায়ে এসে ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা গোত্রপ্রীতি ও স্বজাতির প্রতি আবেগে সমর্পিত হয়। ইসলাম যে বংশ, রক্ত, ভাষা, বর্ণ ভিত্তিক স্বজাতি চেতনাকে নির্মূল করে দেয় মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তি তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে। এরপর অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত আসাবিয়্যাহর চেতনায়

একেকটি গোত্রভিত্তিক রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ইতিহাসের পাতায় দৃশ্যমান হয়। মূলত ৪টি প্রধান শাসনামলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই রূপান্তরকে যথাযথ অনুধাবন করা যায়-

১.উমাইয়া খিলাফত

৬৬১ সালে সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকাকালীন মুয়াবিয়া রা. জেরুজালেমে 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। (Karim 2008, 120) এর মাধ্যমেই মূলত মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র তথা গোত্রীয় শাসন শুরু হয়। যার নেপথ্যে কাজ করেছিলো আরবদের মাঝে লুকিয়ে থাকা চিরায়ত কৌমচেতনা। (Ibid, 122) মক্কা বিজয়ের পর নবদীক্ষিত মুসলিমদের মাঝে উমাইয়া বংশের সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য ছিলো লক্ষণীয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে এই সংখ্যাঘরিষ্ঠ নও মুসলিম উমাইয়াদের কৌমচেতনাকে কাজে লাগিয়ে উমাইয়া রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয় (Najibabadi 2003, 23)। এই সময়ে অধিকাংশ উমাইয়াদের মাঝে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব চেতনার চেয়ে স্বগোত্রীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে জাযিরাতুল আরবে পুনরায় আসাবিয়্যাহ ফিরে আসে।

ইবনে খালদুন সাম্রাজ্যকে মানব জীবনের সাথে যেভাবে তুলনা করে গেছেন সে প্রেক্ষিতে উমাইয়া রাজশক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুয়াবিয়া রাঃ থেকে শুরু হয়ে ৬ষ্ঠ খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক পর্যন্ত এই সময়কে উমাইয়া বংশের উত্থানকাল ধরা যায়। যা মোটামুটি অর্ধশতাব্দী কাল স্থায়ী ছিলো। এ সময়ে উমাইয়ারা চতুর্দিকে বিজয়াভিযানে নিবৃত্ত ছিলো। যার ফলে তাদের প্রান্তরীয় জীবনের সাহসিকতা, তেজবীর্যতা, হিংস্রতা এবং কৌমচেতনার অনেকাংশই তাদের মাঝে অটুট ছিলো। ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অষ্টম খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। তাঁর সময়কে খুলাফায়ে রাশেদার যুগের সাথে তুলনা করা হয়। ওমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর শাসনামলে তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শাসকদের মতো প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থাপনায় আসাবিয়্যাহকে প্রাধান্য দেননি। বরং খুলাফায়ে রাশেদার মতো তিনিও গোত্রচেতনার চাইতে ইসলামিক ভ্রাতৃত্বচেতনাকে প্রাধান্য দেন। নবম থেকে ত্রয়োদশ শাসক পর্যন্ত স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকলেও চতুর্দশ শাসক ২য় মারওয়ানের শাসনকালেই আব্বাসীয়দের উত্থান জানান দেয়। ৭৫১ সালে আব্বাসীয় বংশের উত্থানের ফলে উমাইয়া বংশ শাসনক্ষমতা হারায়। তাদের পতনের নেপথ্যে দুইটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উমাইয়াদের সময়েই ইসলামী সাম্রাজ্য পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে স্পেন অবধি বিস্তৃতি লাভ করে। সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন গোত্র, জাতি, গোষ্ঠীও অধিভূক্ত হতে থাকে। এ সময় যে জটিলতা উমাইয়া শাসকদের সামনে আসে তা হলো, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত ভাবাবেগ ও স্বার্থ সম্বলিত এই নৃ-গোষ্ঠীকে ইসলামী ভ্রাতৃ চেতনায় বাঁধা। দ্বিতীয়ত, আসাবিয়্যাহ তত্ত্বের

আলোকে উমাইয়াদের পতনের কারণ হিসেবে মূলত যে দিকটি ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, তা প্রথম কারণের চেয়েও বেশি জটিলতর। এই জটিলতা তৈরি হয় একটি গোত্রভিত্তিক শাসনের অধীনে সাম্রাজ্যের সকলকে সমচেতনার অনুসারী রাখা। যেখানে শাসক গোত্রই ইসলামের প্রতিশ্রুত সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আহবানের বিপরীতে গোত্রীয় কৌলীন্য বজায় রেখে ধারাবাহিক শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছিলো। এমনতর বৈপরীত্য ও বৈষম্যের ফলেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে বিক্ষোভ আর বিভাজনের সৃষ্টি হয় (Ansari 2018, 129)। ইবনে খালদুনের প্রজন্মের ব্যাখ্যানুসারে একটি রাজবংশ তিন প্রজন্ম বা এক শতাব্দী স্থায়ী হয়। কিন্তু উমাইয়া রাজবংশের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। এক শতাব্দীর কিছু আগেই উমাইয়াদের হাত থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের ভার আব্বাসীয়দের হাতে পৌঁছে যায়। কেবল মুসলিম বিশ্বের সর্ব পশ্চিমের রাজ্য আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফতের অস্তিত্ব টিকে থাকে। ৬৬১ সালে শক্তিশালী আসাবিয়্যাহ-এর ভিত্তিতে গড়ে উঠা উমাইয়া শাসন ৭৫০ সালে পতনের মখোমুখি হলে ঠিক সে সময়ে ইতিহাসের বুকে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আব্বাসীয়দের উত্থান ঘটে।

২.আব্বাসীয় খিলাফত

আব্বাসীয়দের উত্থানকে আসাবিয়্যাহর নিরিখে ব্যাখ্যা করলে চমকপ্রদ বিষয় পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম বিশ্বের শাসকের আসনে বসতে তারা পুরোপুরি গোত্রশক্তির উপর নির্ভর করেনি। ৭৪৭ সালের ৯ ই জুন খোরাসানের মার্ভে আব্বাস রা. এর প্রপৌত্র আবুল আব্বাসের মাধ্যমে আব্বাসীয় শাসনের উত্থান ঘটে। তাদের উত্থানের পেছনে কতকটা রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। উমাইয়া খিলাফতের ক্ষয়িষ্ণু শাসন নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের ফলেই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। চলমান শাসন নীতির বিলোপ ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি কার্যকর করা ছিলো এই বিদ্রোহের মূল দাবি। এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ বিশেষত সাম্রাজ্যের নতুন বিজিত অঞ্চলসমূহে খারেজী, শিয়া, পার্সিয়ানদের মাঝে ছড়িয়ে থাকলেও হাশেমী নামক একটি গোপন বিদ্রোহী দল প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ দলটি রাসূলের স. গোত্র বনু হাশেমের নামে নিজেদের নামকরণ করে এবং রাসূলের স. বংশীয় কাউকে মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক নিযুক্ত করে এ সমস্যার সমাধান করাকে দলের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আব্বাস রা. এর প্রপৌত্র আবুল আব্বাসকে নেতা হিসেবে তারাই সামনে নিয়ে আসে। এই বিদ্রোহের সময় তারা শিয়া ও খোরসানীয়দেরও সাহায্য গ্রহণ করে (N. Zaman 2012, 395)। ৭৪২ সালে এই ত্রিশক্তি সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে উমাইয়াদের পরাজিত করে। ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক ও সামরিক কূটনীতির মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে বসলেও, এই প্রথম মুসলমানদের মাঝে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে নতুন শাসককে ক্ষমতায় বসানোর ঘটনা ঘটে (Ansari 2018,

134)। সব মিলিয়ে উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের আলোকে বলা যায়, আব্বাসীয়রা ক্ষমতার মসনদে বসতে গোত্রপ্রীতি চর্চা না করলেও, তারা গোত্রীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি নিয়ে শাসকের পদে আসীন হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, অভিষেক পর্বে আব্বাসীয়দের শক্তিশালী গোত্রীয় বন্ধন উপলব্ধ না হলেও, পরবর্তীতে শাসনকার্যে তারা উমাইয়াদের মতো করেই গোত্রীয় কৌলীন্য বজায় রাখতে শুরু করে। কখনো কখনো এ জন্য তারা বীভৎস কঠোরতারও পরিচয় দেয়।

ইবনে খালদুনের তত্ত্বানুসারে একটি রাজবংশ সাধারণত চার পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে (Ibn Khaldun 2017, 260, 318)। আব্বাসীয় রাজবংশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শতাব্দী ক্ষমতায় টিকে ছিলো। এর মাঝে ৭৭৫ সাল থেকে ৮৬১ সাল পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছিলো। পরবর্তী শাসকগণ বিশাল সাম্রাজ্য এক কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তারা সাম্রাজ্যের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিতেন আত্মীয় ও নিজ বংশের লোকদেরকে। ফলে গোত্রীয় শক্তি ক্রমে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে সরে বিলাসিতা ও লোভে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। আসাবিয়্যাহ -এর আলোকে আব্বাসীয়দের পতনের কারণ ছিলো বিভিন্ন। প্রথমত, আব্বাসীয়দের বংশীয় কৌলীন্য ছিলো মিশ্র রক্তের অনুসারী। আরব, তুর্কী, পার্সিয়ান, বার্বারী, সাকলাবী বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিলো তাদের মধ্যে। তাই অটুট গোত্রীয় আবেগে একত্র হওয়া তাদের জন্য অনেকটা অসম্ভব ছিলো। দ্বিতীয়ত, তাদের উত্থানের পেছনে একচ্ছত্রভাবে গোত্রীয় শক্তি কাজ করেনি। উমাইয়াদের হটাতে তারা শিয়া ও পার্সিয়ানদেরও সাহায্য গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এই দু'পক্ষের সাথেই তাদের সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, আব্বাসীয় শাসকবর্গ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজ গোত্রের চেয়ে দেহরক্ষী বাহিনী 'মামলূক'দের উপর নির্ভর করতেন। এই মামলূকরা জাতিতে ছিলো তুর্কী। এখান থেকেই এই সাম্রাজ্যের বিভক্তি শুরু হয়। মামলূক ও সালজুক বংশের উত্থানের নেপথ্যেও এই বিষয়টিই কাজ করে। ৯৬৯ সালে মিসরে শিয়া বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফাতেমী রাজবংশও প্রায় একই সময়ে সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে তুর্কীদের আগমনের ফলে আব্বাসীয় রাজবংশের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দীতে সালজুকদের উত্থান ও ধারাবাহিক রাজ্যবিস্তারের ফলে আব্বাসীয়দের মানচিত্র ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। ১২৫৮ সালে মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের আক্রমণে আব্বাসীয়দের পতন চূড়ান্ত হয়ে পড়ে।

৩. সালজুক রাজবংশ

দশম খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়ে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর সালজুক রাজবংশ মুসলিম বিশ্ব শাসন করে। সালজুকরা জাতি হিসেবে ছিলো তুর্কী। ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ এর আলোকে এদের উত্থানের পেছনে মূলত যে

বিষয়টি কাজ করে তা হলো, বেদুইনসুলভ গোত্রীয় বন্ধন, সহজাত শৌর্য-বীর্য, সহজ-সরলতা। অনাড়ম্বর জীবনযাপন, কঠোর শৃংখলাবোধ ও দৃঢ় গোত্রীয় চেতনা তাদের উত্থানের পথকে সুগম করে। এগুলোই কোন প্রান্তরীয় গোত্রকে ক্ষমতার চূড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম। সালজুকদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটিই ঘটে। বিলীয়মান আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যসমূহের মাঝে কলহ বিবাদ যখন প্রবল, তখন খোরাসান সীমানায় সালজুক বংশ তাদের উত্থান জানান দেয়।

১০৩৭ সালে তুগরুল বেগ খোরাসানে প্রথম সালজুক রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২৩ বছর সালজুকদের ইতিহাসের সর্বোত্তম যুগ। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো- তারা নগর সভ্যতার আরাম ও বিলাসিতায় নিজেদেরকে অভ্যস্ত করেনি। এ অভ্যাস চর্চার ফলে তাদের আসাবিয়্যা টিকে ছিলো অনেকদিন। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয় এবং ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে পৃষ্ঠপোষকতা করায় তারা সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সুন্নী আক্বীদায় বিশ্বাসীদের আস্থা অর্জন করে (Maududi 1999, 21)। কিন্তু আব্বাসীয় ও ফাতেমীয়দের বিবাদের ফলে সাম্রাজ্যে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিলো তারই সুযোগে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা ক্রুসেড হামলা শুরু হয়ে যায়। ১০৯২ সালে মালেক শাহের মৃত্যুর পরে সালজুকদের অখণ্ডতা আর থাকেনি। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে মালেক শাহের চার পুত্রের মাঝে যুদ্ধ গোত্রীয় ঐক্য বিনষ্ট করে গৃহবিবাদ সৃষ্টি করে। এরপর ১৩০০ সাল পর্যন্ত সালজুকদের সাম্রাজ্যে ক্রমাগত বিশৃংখলা দেখা যায়। তাদের পতনের পেছনে গৃহযুদ্ধই মূল ভূমিকা রাখে। এই গৃহবিবাদের ফলস্বরূপ সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের আসাবিয়্যাহ তথা গোত্রশক্তির অক্ষুণ্নতা বিনষ্ট হয়ে এ বংশের পতন ডেকে আনে। বিভক্ত সাম্রাজ্যের কারণে সালজুক বংশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তি গুপ্ত ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারায়। ধারণা করা হয়, এই ঘাতকেরা অ্যাসাসীন নামক গুপ্ত সংগঠনের সদস্য (Ansari 2018, 186)। এমন অস্থিরতার সময় ক্রুসেড আক্রমণের স্বীকার হয় গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য। গোত্রীয় কলহে লিপ্ত সালজুকরা এ ক্রান্তিলগ্নেও ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়।

৪. অটোমান সাম্রাজ্য

অটোমান বা উসমানীয়দের উত্থান ১২৯৯ সালে তুর্কী বংশোদ্ভূত উসমান বিন ইরতুগরুলের হাত ধরে। সালজুকদের মতো এরাও জাতিতে তুর্কী। মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ১২৫৮ সালে এরা আনাতোলিয়ার দিকে সরে আসে। আসাবিয়্যাহ

তত্ত্বের নিরিখে উসমানীয় বংশের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাসের বিচারে বলা যায়, মূলত যাযাবর গোত্র হিসেবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতেই আনাতোলিয়ায় তারা একটি শক্তিশালী দুর্ভেদ্য গাজী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। পরে ক্রমান্বয়ে নিজেদের শক্তিশালী করার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। শক্তিশালী গোত্রীয় চেতনা ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের ফলে তারা দুর্বল রাষ্ট্র গুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

১৭০৩ সালে ২য় মুস্তফার শাসন আমল পর্যন্ত, প্রায় চারশত বছর ধরে এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগ অব্যাহত থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, উসমানীয়রা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে সুসংবদ্ধ করেছে। তাদের বিস্তৃতির ইতিহাসে তাড়াহুড়া বা, অন্যসব রাজশক্তির মতো প্রলয়ংকরী ভাব কম পরিলক্ষিত হয়। শুরুর দিকে চুক্তি, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও ভূমি ক্রয়ের মাধ্যমে তারা প্রভাব বিস্তার করতো। এই অব্যাহত বিজয় ও বিস্তৃতির পেছনে দুইটি বিষয় কাজ করে, ১. দৃঢ় জাতীয় চেতনা অর্থাৎ, আসাবিয়্যাহ এবং ২. শক্তিশালী জেনেসারী বাহিনী। (Hossain 2013, 15) এরপর ১৭০৩ থেকে শুরু হয়ে ১৯২৩ সালে ২য় আবদুল মজীদের শাসন আমল পর্যন্ত এই বংশ ধীরে ধীরে পতনের মুখোমুখি হয়।

১২৯০ সালে ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেঁষে যে শক্তিশালী অটোম্যান শাসনের গোড়াপত্তন হয়, সেটি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ছয় শতাব্দী। এতো দীর্ঘ সময় সাম্রাজ্য টিকে থাকার কারণ হিসেবে দেখা যায়, বংশকৌলীন্য রক্ষায়, উত্তরাধিকার নির্বাচনে, প্রশাসনিক বিন্যাস প্রক্রিয়ায় ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলায় সুসংহত ব্যবস্থাপনা। এই প্রক্রিয়াগুলো যে ইসলামের বিধানের আলোকে সম্পন্ন হতো, তা নয়। এগুলো ছিলো তাদের নিজস্ব রীতি পদ্ধতির আলোকে। তবে দীর্ঘ সময় সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য নিঃসন্দেহে সহায়ক ছিলো। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এ সাম্রাজ্যের আসাবিয়্যাহ এর ভিতকে দুর্বল করে তোলে বারবার। শক্তিশালী এই রাজবংশের পতনের কারণ হিসেবে আরো দেখা যায়- পরবর্তী প্রজন্মের প্রশাসনিক অযোগ্যতা, বিলাসিতা, ইউরোপীয়দের বিজয় স্পৃহা। যার ফলে উসমানীয়দের মানচিত্র সংকুচিত হতে থাকে (Cageptay 2006, 4)।

উপর্যুক্ত সাম্রাজ্যগুলোর উত্থান-পতনের ইতিহাসে চোখ বুলালে ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে গোত্রপ্রীতি বা স্বজাতি চেতনায় আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-

১. এ সময় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার মতো ব্যাপারে মানুষ গুরুত্ব দিয়েছে তার জাতীয়তাবোধকে- স্বজাতির কল্যাণ কামনাকে। আর ধর্মকে রেখে দিয়েছে আদর্শিক জায়গায়।

২. আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ধর্মই সবসময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অধিকাংশ শাসক স্বগোত্র কিংবা পরিবারকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যদিও ইসলাম এতে সায় দেয়নি এবং এটি ইসলামের ভাবধারার পরিপন্থি।

৩. খুলাফায়ে রাশেদার পর মুসলমানরা গোত্রপ্রীতিকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে সমভাবে প্রাধান্য দিতে পারেনি। এর ফলে সংকীর্ণ গোত্র-চেতনা এবং পার্থিব ক্ষমতার লোভ এই রাষ্ট্রশক্তি গুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে বারবার। বিলাসিতা যে কোন কৌমচেতনার অধিকারীদের থেকে তাদের শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, ত্যাগের মনোভাব, বিজয় স্পৃহা ছিনিয়ে নেয়। ফলে, যে কোন সম্প্রদায় যখন বিলাসিতায় মত্ত হয়ে পড়ে, তাদের পতনও ত্বরান্বিত হয় (Ibn Khaldun 2017, 262, 267, 313, 315)।

এই ক্ষমতার উত্থান-পতনে ইবনে খালদুন তখনকার গোত্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজশক্তি তথা রাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিকেই আসাবিয়্যাহ-এর উপাদান ও মূলভিত্তি বলে বিবেচনা করেছেন। আর ধর্মকে রেখেছেন আদর্শিক প্রাণশক্তির জায়গায়। ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ গোত্রপ্রীতি দ্বারা অর্জন সম্ভব হলেও একটি সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তর জনগোষ্ঠীর মন একসূত্রে গাঁথা কেবল ধর্মের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব (Ibn Khaldun 2017, 297)। তাই একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষমতার ভিত্তি হলো ধর্ম। অতএব, ধর্ম আসাবিয়্যাহ বা জাতীয়তার উপাদান নয়। বরং, ধর্ম হলো, বহুসংখ্যক মানুষের হৃদয়কে একই ভাবাবেগে গ্রথিত করার সূত্র। যেখানে বহুসংখ্যক গোত্র, সম্প্রদায় এবং জাতির পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব।

মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ

প্রায় ১৩শত বছরের মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিমরা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ভুলে আসাবিয়্যাহ বা গোত্রপ্রীতিকে ক্ষমতারোহনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার সাথে সাথে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে ইসলাম তথা ধর্মকেও লালন করেছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের চর্চা অটোম্যান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র তুরস্কেই প্রথম শুরু হয় ১৯০২ সালে। সেখানে তখন ধর্মকে বাদ দিয়ে তুর্কী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি প্রচার করা হয় (Hossain 2013, 105)। এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষবাদ গ্রহণ করবার পর ইউরোপীয় বিপ্লব হেতু তুরস্কে আগত হাঙ্গেরীয় ও পোলিশ শরণার্থীদের থেকে তুর্কী জাতিকে আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে পরিচিত করবার প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়ে পড়ে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হবার কালে এই তুর্কী জাতীয়তাবোধ আরো সক্রিয় হয়ে উঠে। এ সময়ে

এটি অটোম্যান সাম্রাজ্য চেতনার সাথে একীভূত হয়ে থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্র গঠন হওয়ায় এই জাতীয়তাবাদী চেতনা পাশ্চাত্যের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

এরপর বৃহত্তর পরিসরে আরব জাতীয়তাবাদ চেতনার উত্থান হতে দেখা যায়। এর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন আব্দুর রহমান কাওয়াকিবী (১৮৪৯-১৯০২ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ রশীদ রিজা (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রি.)। এরা মূলত তুর্কী জাতীয়তাবাদ থেকেই প্রেরণা লাভ করেছেন (Stepan Trokhimchuk 2005, 4)। এই দুই লেবানীয় নেতা কুরআনের ভাষা, ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক হিসেবে আরবী ও আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন তাঁদের লেখনীতে। আর তুর্কী ও অন্যান্য জাতির উত্থানকে ইসলামী সভ্যতার পতনের কারণ বলে বিবেচনায় আনেন। তাঁরা মুসলিম সভ্যতার পুনঃবিকাশে আরবের গুরুত্ব তুলে ধরেন। একই সময়ে খ্রিস্টানদের দ্বারা আন-নাহদাহ (পুনর্জাগরণ) ও আরবী ভাষার সংস্কার হয়। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের এই সম্মিলিত আরব সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াই আরব জাতীয়তাবাদ বলে পরিচিত। পরবর্তীতে মিসরের জামাল আবদুন নাসের ১৯৫৬ সালে আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আরব রাষ্ট্রসমূহ একীভূত করেন (Hossain 2013, 271)।

ভারতবর্ষে এই জাতীয়তাবাদী ধারাটি প্রতিবিম্বিত হয় স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনে। আলীগড় আন্দোলন সংস্কার আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হলেও, এই সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলিম জাতির আধুনিকায়ন। তিনি আমৃত্যু পিছিয়ে পড়া মুসলমানদেরকে জাতি হিসেবে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ করে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আলীগড় আন্দোলন তুর্কী ও আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো সফল না হলেও ভারতীয়দের জন্য এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

পরে এই তিনটি জাতীয়তাবাদী ধারণাই উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ পুরো প্রক্রিয়াটি এমন যে, বহুজাতিভিত্তিক মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়। তারপর আবার মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের মাঝে আঞ্চলিকতা, ভাষা, ধর্মীয় ঐক্য ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলে (Fuller 2016, 263)।

ইসলামী জাতীয়তার ভিন্নমাত্রা

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছাড়াও এ সময়ে মুসলমানদের মাঝে আরো দু ধরণের ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়।

ওহাবিজমঃ মুসলিমদের একটি অংশ ছিলো ওহাবী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। তারা ঔপনিবেশিক আমলে ইসলামের বিরুদ্ধে ধেয়ে আসা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধতাকে আবশ্যক মনে করলেন। তারা মুসলমানদের মাঝে মূল ইসলামী ভাবধারা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। এই সংস্কার আন্দোলনটির নাম ওহাবিজম বা ওহাবী আন্দোলন (Ansari 2018, 334-342)। সৌদি আরব ও এর সন্নিহিত এলাকায় এই সংস্কার আন্দোলন সক্রিয় ছিলো। ভারতবর্ষেও এ সংস্কার ভাবধারায় বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালিত হয়। এর মাঝে ফরায়েজী আন্দোলন, বেরলভী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

প্যান-ইসলামিজমঃ মুসলিম উম্মাহর অন্য একটি অংশ ছিলো প্যান ইসলামিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। এরা মনে করত, মুসলমানদের ইসলামের মৌলিক ভাবধারায় ফিরে আসার সাথে সাথে এর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও হারানো গৌরবও ফিরিয়ে আনতে হবে। কেননা, ইসলামই সর্বাধিক বিজ্ঞানমনস্ক, সবচেয়ে আধুনিক জীবনব্যবস্থা। ধর্মের মৌলিক চর্চার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করাও জরুরী। তারা উদীয়মান পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলমানদের সমানতালে এগিয়ে নেয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন (Sever 2010, 13)। তাদের মতে, এ প্রক্রিয়াটি হবে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিলীন হয়ে নয় বরং নৈতিকতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করার মাধ্যমে। এজন্যই সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আবার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে এক হতে হবে। এ আন্দোলনটি প্যান ইসলামিজম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্যান ইসলামিজম ধারণার প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানী স্বয়ং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরিভ্রমণ করে এই চিন্তাগুলোকে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনগুলো অপেক্ষা এই আন্দোলনটি মুসলিম বিশ্বে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হয় (EFSAS June 2017)।

মিসরে স্যার জঘলুল পাশার ওয়াফদ পার্টি, হাসান আল বান্নার ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সুদানে মাহদী আন্দোলন তার চিন্তাকে কাঠামোবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দেয়। এছাড়াও মিসরের মুফতি মোহাম্মদ আবদুহু, সিরিয়ার রশীদ রিজা, ভারতবর্ষে আল্লামা ইকবাল, বসনিয়ায় আলীয়া আলী ইজ্জত বেগোভিচ- তাঁর মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁরা মুসলিম পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নিরলস চিন্তা ও শ্রম দিয়ে গেছেন।

এ ভাবধারার আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে দেখা যায়। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনধারায় মিল-অমিল যাই থাকুক ইসলামই ঐক্যের প্রাণশক্তি। কখনো কখনো তা স্বজাতি থেকে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। (Huntington 2014, 210-211) এই ঐক্য নির্দিষ্ট কোন মঞ্চ না পেয়ে এবং যুগোপযোগী নেতৃত্ব ও সুস্পষ্ট

দিকনির্দেশনার অভাবে ইতস্তত। কখনো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রায় ব্যর্থ আন্দোলন পরিচালনা করেছে, আবার কখনো নিজ দেশের অযোগ্য শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো প্রায়ই স্বজাতির বৃহৎ অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে না। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া আরব বসন্ত, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ক্ষমতায় আরোহন- অবরোহন, সোভিয়েত বিরোধী তালেবান আন্দোলন, হামাস-ফাতাহর ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সীমিত জাতীয়তাবাদ ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায়

খুলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিমরা গোত্রপ্রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একে অন্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এটা অব্যাহত থেকেছে ঔপনিবেশিক আমলে অটোমানদের চূড়ান্ত পরাজয় পর্যন্ত। এরপর মুসলমানরা ঔপনিবেশিক আমলে একে একে ক্ষয়ে যাওয়া ভূখণ্ডকে স্বাধীন করবার জন্য পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে নিজেদের জন্য পছন্দ করেছে। এটা অব্যাহত থেকেছে সর্বশেষ সোভিয়েত আমল থেকে বসনিয়া হার্জেগোবিনার স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত। এমনকি চলমান বিভিন্ন মুসলিম স্বাধীনতাকামী আন্দোলনও আংশিক বা সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। যেমন, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন (EFSAS June 2017, 2)। যদিও এদের প্রতি বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আবেগ অনুভূতি জড়িয়ে আছে। আলীয়া ইজ্জত বেগোভিচ মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থানকে দেখেছেন ধর্মভিত্তিক রহস্যবাদী মুসলিমদের উপপ্রতিষ্ঠান ধারণার বিপরীতে বুদ্ধিজীবীদের ভাবাবেগ সম্বলিত বিবেচনা হিসেবে (Izetbegovic 2017, 20)। তাঁর মতে, ইসলামের নৈতিক দিকটিকে উপেক্ষা করে তারা ইসলামকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এর নাম হলো মুসলিম জাতীয়তাবাদ। যা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতোই ধর্মীয় সারাংশ ও নৈতিকতা বিবর্জিত ।

জাতীয় ঐক্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই চিন্তাধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। শতাব্দীর সূচনাতেই আমেরিকার ৯/১১ হামলা এবং এর প্রেক্ষিতে সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সম্মিলিত অভিযোগ গঠন, শুধু অভিযোগ গঠনই নয় এ ঘটনার মাত্র একমাসের মাথায় মধ্যপ্রাচ্যে ধারাবাহিক হামলা মুসলিম জাতির প্রত্যেককেই বিস্মিত করেছে। তাদের এই অহেতুক অভিযোগ শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি দু'টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় বরং পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে। এর ফলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ২টি অংশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যার একটি পক্ষ, অতি আধুনিক বিশ্বমোড়ল রাষ্ট্র আমেরিকা আর অপর পক্ষ অনুন্নত, পুষ্টিহীন এবং বিভক্ত অঞ্চলের

পুরো মুসলিম বিশ্ব (Ahmad 2002, 20-45)। যদিও ১৯৪৮ সালের ব্যালফোর ঘোষণায়[৩] (The Balfour Declaration) আরব বিশ্বে বিষফোঁড়ের মতো ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হবার পরপর মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ১৯৬৯ সালে OIC (Organization of Islamic Cooperation) প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস চালায়। তবে আরবের শেখ দ্বন্দ্ব, শিয়া-সুন্নী বিবাদ এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। শুধু তাই নয়, পুরো বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের মধ্যে একাধিকবার ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখে। যেমন, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ। এ যুদ্ধগুলোর ফলে নড়বড়ে মুসলিম ঐক্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে, কিন্তু ৯/১১ এর হামলা এবং তৎপরবর্তী মুসলিম বিশ্বের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মিলিত হামলা মুসলিমদের আরো একবার ঐক্যের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। মূলত, কঠিন পরিস্থিতিই অন্যান্য সব জাতীয় পরিচিতিকে পেছনে ফেলে মুসলিম পরিচিতিকে প্রাধান্য দিতে উদ্বুদ্ধ করে (Fuller 2016, 261)। জাতীয়তাবোধ ছাপিয়ে ইসলাম তখন সম্প্রসারিত ও আন্তর্জাতিক সংহতির মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম তরুণ ও যুবকেরা অগ্রগামী। এরা নিজেদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ, নেতৃবৃন্দের অনৈক্য এবং ভূ-রাজনীতির বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর পাশ কাটিয়ে এক হতে বদ্ধ পরিকর। মুসলিম যুবকদের পুনর্জাগরনের প্রচেষ্টাগুলো, OIC এবং অন্যান্য ঐক্য সংস্থাগুলো তাদের লক্ষ্য মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, ঐক্যের মূলসূত্র কি হওয়া উচিত তা নিয়ে মুসলিমরা দ্বিধা বিভক্ত। তবে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রায় সকল মুসলিম চিন্তাবিদেরা নিরুৎসাহিত করেছেন। তবে আসাবিয়্যাহ-এর ইতিবাচক ব্যবহার মুসলিম ঐক্য ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে সহায়ক হতে পারে (Asyiqin Abdul Halim 2012, 42)। কারণ, সীমিত জাতীয়তাবাদের আদর্শ নয়; ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনাই নানান বৈশিষ্ট্যের বহু জাতিকে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায়, বৈষম্যহীনভাবে এক সুতোয় বাঁধতে পারে। কারণ, ইসলাম কোন জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার নয় বরং এর উদাহরণ একটি জাতিপুঞ্জের মতো (Muhammad_Iqbal 2018, 157)। এটি কোন জাতির, বংশের, ভাষার, বর্ণের, অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে পরিচয়ের সৌকর্য হিসেবেই স্বীকার করে (Al-Quran, 49:13, 30:22)। মুসলিম জাতি যদি এক হতে চায়; তবে ধর্মের ঐকতানেই

৩. ২রা নভেম্বর, ১৯১৭, ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের জাতীয় বাসস্থান করার ঘোষণা দিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস ব্যালফোর ইয়াহুদী সংগঠক লর্ড জেমস রথচাইল্ডকে একটি চিঠি লিখেন। যেখানে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের জাতীয় বাসস্থান করার আশ্বাস দেয়া হয়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ৫ই মে ফিলিস্তিনে ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাদেরকে এক হতে হবে (Al-Quran, 8:63)। বংশ-গোত্রের স্বাতন্ত্র্য ও মানব রচিত জাতীয়তার সীমারেখাগুলো মেনে নিবে তার পরিচয়ের সৌকর্যের জন্য।

উপসংহার

আসাবিয়্যাহ বা কৌমচেতনা রাষ্ট্রের উত্থানের প্রাচীন যুগ থেকেই রাষ্ট্রগঠন, রাজ্যশক্তি লাভ এবং ক্ষমতার চূড়ায় আরোহণের স্বাভাবিক মাধ্যম বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলের সা. প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ও তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জাতিবোধ নয় বরং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল আসাবিয়্যাহ বা জাতীয়তাবাদ নয়, বরং ইসলামী ভ্রাতৃচেতনাকে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ভ্রাতৃচেতনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা কৌমচেতনার বহুত্বমূলক সমন্বয় ঘটেছিল। আর সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের বন্ধন সকলের মনকে এক সূত্রে গেঁথে রাখে। যার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকতে পারে। বহুযুগ ধরে কৌমচেতনায় অভ্যস্ত আরবরা মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে গোত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে, তা এক গোত্র শক্তি থেকে অন্য গোত্র শক্তির কাছে হস্তান্তরিত হতে হতে ক্রমস্তিমিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের মাঝে। এক সময়ের বিস্তৃত সাম্রাজ্য আজ সময়ের বিবর্তনে বিশ্ব মানচিত্রের বুকে শতাধিক জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রায় ১৩শত বছরের ইতিহাস ইবনে খালদুনের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। সাধারণত স্বজাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজশক্তি একশতাব্দী কাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। আর বেশি শক্তিশালী গোত্রশক্তির দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী অথবা ক্ষয়িষ্ণু গোত্রশক্তি পরাজিত হয়। যার ফলে শক্তিশালী গোত্রশক্তি শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়। আসাবিয়্যাহ তত্ত্বের দ্বারা খালদুন রাজ্যশক্তির ক্রমোত্থান থেকে পতন, এক গোত্র বা জাতির থেকে অন্য গোত্র বা জাতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসলিম জাতি যদি আজ আবার ধর্মের ঐকতানে নিজেদের এক করতে চায়, তবে বহুত্বমূলক মুসলিম জাতীয়তাতে সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যেখানে সীমিত বংশ- গোত্রের স্বাতন্ত্র্য ও মানব রচিত জাতীয়তার সীমারেখাগুলো মেনে নিবে এর পরিচয়ের সৌকর্যের জন্য।

Bibliography

Abū Dāwud. 2008. Sunane Abū Dāwud. Riyadh: Dār al-Salām.

Ahmad, S. Akbar. 2002. "Ibn Khaldun's Understanding of Civilization and the Dilemas of Islam and West Today." *The Middle East Journal* 56(1), 20-45.

Ansari, Tamim. 2018. *Destiny Disrupted*. Translated by Ali Ahmad Mabrur. Dhaka: Gurdian Publication.

Asyiqin, Abdul Halim, Nor, Mohd Roslan Mohd & Ibrahim, Ahmad Zaki Berahim. 2012. "Ibn Khaldun's Theory of 'Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society." *Middle-East Journal of Scientific Research* 11(9), 1232-1237.

Cageptay, Soner. 2006. *Islam Secularism and Nationalism in Modern Turkey*. Oxon: Rutledge Publication.

EFSAS, European Foundation for South Asian Studies. 2017. "Youth, Pan-Islamism and Radicalization of Kashmiri." *European Foundation for South Asian Studies (EFSAS)*, Amsterdam: EFSAS (14).

Enan, Mohammad Abdullah. 2006. *Ibn Khaldun his life and works*. New Delhi: Kiab bhavan.

Fuad Bali. 1998. *State and Urbanism Ibn Khaldun's Sociological Thoughts*. NewYork: State University of NewYork Press.

Fuller, Graham E. 2016. *A World Without Muslim*. Dhaka: Ankur Prakashani.

Gettel, Raymond G. 1950. *Political Science*. India: The World Press Private Ltd.

Haque, Abūl Kashem Fajlul. 2014. *Jatiyatabad Antarjatikatabad Bishwayan O Vabishyat*. Dhaka: Jagriti Prakashani.

Hossain, A B M. 2013. *Maddha Praccer Itihas: Ottoman Samrajjo Theke Jatiswatta Rashtra*. Dhaka: University Grants Commision.

Huntington, Samuel P. 2014. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Translated by Sqn Ldr Ahsan Ullah (Retd). Dhaka: Ankur Prakashani.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 2017. *Al-Muqaddima*. Translated by Golam Samdani Qurayeshi. Dhaka: Dibya Prakashani.

Islam, Muhammad Nurul. 2014. *Islam O Onnanno Matabad*. Dhaka: ICS Publication.

Izetbegovic, Alia Ali. 2017. *Pracco Paschatto O Islam*. Translated by Iftekhar Iqbal. Dhaka: Banglayon.

Karim, Muhammad Reza E. 2008. *Arab Jatir Itihas*. Dhaka: Bangla Academy.

Maududi, Saiyed Abūl A'la. 1999. *Saljuk Rajatter Itihas*. Dhaka: Adhunik Prakashani.

Muhammad Iqbal, Allama. 2018. *Islamer Dharmiyo Cintar Punarghathan*. Translated by Mohammad Moqsed Ali, Prof. Saidur Rahman, Abdul Haque Kamal Uddin Khan. Dhaka: Prothoma Prakashani.

N. Zaman, M. Ahmed, I. Shahzad, S. N. Hamdani. 2012. "Islamic Nationalism A Contemporary View." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 4(5) 394-400.

Najibabadi, Maulana Akbar Shah. 2003. *Islamer Itihas*. Dhaka: Islamic Foundation.

Nuruzzaman, Md. 2013. *Cirayata Samajcinta*. Dhaka: Nabajug Prakashani.

Oxford. 1995. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. NewYork: Oxford University Press.

Qutub, Saiyed. 2011. *Fī Jilāl al-Qurān*. Translated by Akram Faruque. London: Al-Qurān Academy.

Sen, Anupam. 2008. *Bakti, Rashtra: Samaj-Binyas O Samaj-Darshaner Aloke*. Dhaka: Obosor Prakashana Sangstha.

Sever, Aytek. 2010. *A Pan-Islamist In Istanbul: Jamal Ad-Din Afghani And Hamidian Islamism, 1892-1897*. Ankara: The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University.

Shibli Nomani, Allama. 2018. *Omar Faruque (R.)*. Translated by Maulana Lutfur Rahman. Dhaka: Meena Book House.

Stepan Trokhimchuk, Solomia Zinko. 2005. *Islam and Nationalism Cooperation and Rivalry of Ideologies*. Ivan National University of Lviv.